ভোরের কাগজ

তারিখ 20 JAN 2003
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ...

উপবৃত্তির টাকা বিতরণ ও শিক্ষার্থীদের নাম অন্তর্ভুক্তি নিয়ে জালিয়াতি

কুড়িগ্রামে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় চরম বিপর্যয়

পরিমল মজুমদার ও তৈয়বুর রহমান, কুড়িগ্রাম থেকে : উপবৃত্তির টাকা বিতরণ ও ছাত্রছাত্রীদের নাম অন্তর্ভুক্তি নিয়ে জালিয়াতিকে কেন্দ্র করে জেলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

একই ছাত্রছাত্রীকে একাধিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, তাদের নামে উত্তোলিত টাকা আত্মসাৎ, ভুয়া হাজিরা, শর্ত অনুযায়ী ৪৫ শতাংশ পাস নম্বর ও ৭৫ শতাংশ হাজিরা নিশ্চিত দেখাতে স্কুলগুলোর শিক্ষকবৃন্দ হিমশিম খাওয়াতে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানের কোনো ফুরসতই তাদের মিলছে না। ফলে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর জীবনে নেমে এসেছে চরম বিপর্যয়। তদারকি কর্মকর্তারা অবৈধভাবে উত্তোলিত উপবৃত্তির টাকার বখরা নিতে ব্যস্ত থাকায় 'বেড়ায় ক্ষেত খাওয়ার' অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

অন্যদিকে কাঁচা টাকার লোভ সামলাতে না পারায় জেলার বিভিন্ন স্কুলে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষদের মাঝে চলছে তীব্র ক্ষমতার লড়াই ও দলাদলি। ভাগাভাগির দ্বন্দ্বে প্রধান শিক্ষক বরখাস্ত, মামলা-পাল্টা মামলায় এক হুলস্থূল অবস্থা বিরাম করছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলোতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, অধিকাংশ মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি প্রাপ্তির নিয়মকানুন মানা হচ্ছে না। বরং একই ছাত্রীকে একাধিক বিদ্যালয়ে ভর্তি দেখিয়ে ঐ ছাত্রীকে নিয়ে টাকা উত্তোলন করিয়ে অর্ধেক টাকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্টের প্রকল্প কর্মকর্তারা ভাগাভাগি করে নিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে একাধিক প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে যে শর্ত দেওয়া হয়েছে তা মেনে চললে ০ দশমিক ৫ শতাংশ ছাত্রী টাকা পেতে পারে। অথচ নিয়ম রয়েছে এই উপবৃত্তি দরিদ্র পরিবারের ৪৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রীকে দেওয়া যেতে পারে। সূত্র মতে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দরিদ্র পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে খুবই কম হাজির থাকে এবং কয়েকমাস পর একেবারেই বিদ্যালয়ে আসে না, ঝরে পড়ে। এছাড়া ০ দশমিক ৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ছাড়া সকলেই ফেল করে এবং তাদের হাজিরা ৭৫ শতাংশের বহুগুণ নিচে।

এ বাস্তবতা সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকলেও অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের উত্তীর্ণ, ৭৫ শতাংশ ভুয়া হাজিরা ও ৪৫ শতাংশ কিংবা তারও ঊর্ধ্বে ভুয়া নম্বর দেখিয়ে উপবৃত্তির টাকা উত্তোলন করা হচ্ছে। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের সঙ্গে যোগসাজশ করে প্রধান শিক্ষকরা একই ছাত্রছাত্রীকে একাধিক বিদ্যালয়ের ছাত্র দেখিয়ে টাকা উত্তোলন করে ভাগাভাগি করে নিচ্ছে। এ অবস্থায় কাগজপত্রের গরমিল সংশোধন, জালিয়াতি ও টাকা ভাগাভাগিতে তাদের স্কুল সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ও ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় মনোযোগী করতে কোনো সময়ই তারা দিতে পারছেন না।

অন্যদিকে এসব বিষয়ে তদারকি করার জন্য মাধ্যমিক স্তরে ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট অফিসার ও থানা শিক্ষা অফিসারগণ দায়িত্বে থাকলেও তারা উপবৃত্তির টাকার বখরা নিতে ব্যস্ত। ফলে উপবৃত্তি প্রদানের যে উদ্দেশ্য তা পুরো ভেস্তে যেতে বসেছে। শিক্ষার্থীদের জীবনে নেমে এসেছে চরম বিপর্যয়।

শিক্ষা ব্যবস্থার এ বেহাল অবস্থা ও দুর্নীতি প্রসঙ্গে একাধিক শিক্ষকের সঙ্গে কথা বললে তারা ভোরের কাগজকে বলেন, 'উপবৃত্তির টাকা যেহেতু দাতা সংস্থা দিয়ে থাকে তাই তা ফেরত না দিয়ে মেরে খাওয়াই ভালো'।

অন্যদিকে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে দাতা সংস্থার উপবৃত্তির টাকার লোভে এ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলোতে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি কে হবেন এ নিয়ে চলছে চর দখলের মতো লড়াই। বখরা না পেয়ে শিক্ষক বরখাস্ত, কমিটি বাতিল, মামলা ও পাল্টা মামলায় জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার বারোটা বাজার উপক্রম হয়েছে। হুলস্থূল পড়ে গেছে স্কুল ও মাদ্রাসাগুলোতে।